গণবিদ্রোহে শামিল হওয়ার অভিযোগে
১৩ জন মারুতি শ্রমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
কিছু প্রশ্ন, কিছু সন্দেহ

প্রকাশকাল এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক মন্থন সাময়িকী
বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা
কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ ০৩৩ ২৪৯১৩৬৬৬
ই-মেল manthansamayiki@gmail.com

সংকলক জিতেন নন্দী (শের সিং সম্পাদিত হিন্দিতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ‘ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার’-এর বিভিন্ন সংখ্যায় মারুতি শ্রমিকদের নিজস্ব বয়ান থেকে বাংলায় তরজমা করে এই পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।)

মুদ্রণ প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য ৬ টাকা

গণবিদ্রোহে শামিল হওয়ার অভিযোগে ১৩ জন মারুতি শ্রমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কিছু প্রশ্ন, কিছু সন্দেহ

মারুতি সুজুকি কোম্পানি : সামান্য পরিচয়

আজ ভারতের সবচেয়ে বড়ো মোটরগাড়ি কোম্পানির নাম মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড। ১৯৮৩ সালে মারুতি গাড়ির উৎপাদন শুরু হয়েছিল কোম্পানির গুরগাঁও প্ল্যান্টে। ২০০৬ সালে কোম্পানি মানেসর প্ল্যান্ট তৈরি করে।

গুরগাঁও জেলায় এক অত্যাধুনিক শিল্পাঞ্চল হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেল টাউনশিপ (সংক্ষেপে আইএমটি) মানেসর গড়ে তোলা হয় গুরগাঁও শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে। সেখানে বর্তমানে এক হাজারের বেশি কারখানায় দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করে। মানেসরের ধারুহেরা থেকে রেওয়ারি পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অটোমোবাইল কারখানার বেল্ট। মানেসরের সবচেয়ে বড়ো উদ্যোগ হল মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড, তাদের তিনটে প্ল্যান্ট মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২৭০০ গাড়ি তৈরি হয়। এই তিনটি প্ল্যান্টের বাইরে আরও কয়েকশো ছোটো ছোটো কারখানায় মারুতি গাড়ির নানা পার্টস তৈরি হয়।

১৯৭১ সালে সঞ্জয় গান্ধী শুরু করেছিলেন ছোটো গাড়ির প্রকল্প মারুতি মোটর্স লিমিটেড। ১৯৭৭ সালে সেই কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পর তার সরকারিকরণ করা হয়, নামকরণ হয় মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড। ১৯৮৩ সালে জাপানের সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ওইবছর ডিসেম্বর মাসে কোম্পানির গুরগাঁও কারখানা থেকে প্রথম গাড়ি তৈরি হয়। সেই সময় এই যৌথ উদ্যোগে ভারত সরকারের শেয়ার ছিল ৭৬% এবং সুজুকি কোম্পানির ২৪%। ক্রমশ সুজুকির শেয়ার বাড়তে থাকে। ১৯৮৭ সালে তাদের শেয়ার ছিল ৪০%, ১৯৯২-তে আধাআধি এবং ১৯৯৮-তে বেড়ে ৫৪% হওয়ার পর মারুতি কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সুজুকির হাতে চলে যায়। ২০০৭ সালে নাম হয় মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড, একটি বেসরকারি উদ্যোগ। গুরগাঁও প্ল্যান্টে ১৯৮৩ সালে দক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উৎপাদন শুরু হয়েছিল। ১৯৯২ সালে এখানে ৪৫০০ স্থায়ী শ্রমিক এবং ২২০০ অন্যান্য কর্মচারী কাজ করত। ১৯৯৭ সাল থেকে স্থানীয় ঠিকেদারদের মাধ্যমে ঠিকা শ্রমিক নেওয়া শুরু হয়। ২০০০ সালে যখন প্রথম ধর্মঘট হল, ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ চালু রাখা হল। ইউনিয়নকে হাত করে ধর্মঘট করানো হয়েছিল, যাতে শ্রমিকদের দুর্বল করে ফেলা যায়। ২০০১ সালে ১২৫০ জন স্থায়ী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হল। ২০০৩ সালে আবার ১২৫০ জন ছাঁটাই হল। ২০০৭ সালে এসে মারুতি সুজুকির এই গুরগাঁও ফ্যাকট্রিতে ১৮০০ স্থায়ী এবং ৪০০০ ঠিকা শ্রমিক কাজ করত। তখন স্থায়ী শ্রমিকদের মাইনে ছিল ২৫০০০ টাকা, ঠিকা শ্রমিকরা পেত ৩৫০০-৫০০০ টাকা। এছাড়া ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, ওখলা এবং নয়ডা শিল্পাঞ্চলে বহু জায়গায় মারুতি গাড়ির বেশিরভাগ কাজ করিয়ে নেওয়া হত। একসময় মাসে মাত্র ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা মাইনে দিয়ে মারুতি গাড়ি তৈরির বিভিন্ন কাজ করানো হয়ে এসেছে। ২০১১ সালে ৩০০ একর জায়গার ওপর পুরোনো গুরগাঁও ফ্যাকট্রির তিনটে প্ল্যান্টের উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল বছরে ৭ লক্ষ গাড়ি। ৬০০ একর জমির ওপর মানেসরের দ্বিতীয় ফ্যাকট্রিতে ২০০৭ সালে উৎপাদন শুরু হয়। এখানকার অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টের উৎপাদন-ক্ষমতা বছরে ৩ লক্ষ গাড়ি। ২০১২ সালের মার্চ মাস থেকে কোম্পানির পঞ্চম অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে আরও আড়াই লক্ষ গাড়ি তৈরি শুরু হয়। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে মারুতি সব মিলিয়ে ১৪ লক্ষের বেশি গাড়ি তৈরি করেছে।

১৮ জুলাই ২০১২
কোন পরিস্থিতিতে মারুতি কারখানার ১নং মানেসর প্ল্যান্টে শ্রমিকদের দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহ ঘটেছিল?

১৮ জুলাই ২০১২ মানেসরে মারুতি মোটরগাড়ি কারখানার ১নং প্ল্যান্টে সন্ধ্যার সময় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিক দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের (এইচ আর) জেনারেল ম্যানেজার প্ল্যান্টের ভিতরেই মারা যান — আগুনে পুড়ে না দমবন্ধ হয়ে — মৃত্যুর কারণ দীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও জানা যায়নি। এই ঘটনা দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়ও বটে। কিন্তু কীভাবে এত বড়ো ঘটনা ঘটল? এক অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমরা যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনার কিছুটা আগে থেকে মারুতি সুজুকি মানেসর কারখানার ঘটনাবলীর দিকে নজর করব। কেননা ১৮ জুলাইয়ের ঘটনার জেরে সম্প্রতি ১৩ জন বন্দি মারুতি শ্রমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে গুরগাঁওয়ের অ্যাডিশনাল সেশন কোর্ট।

২০১১ সালে মারুতি মানেসর ফ্যাকট্রির পরিস্থিতি

২০১১ সালে এখানে ৯৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক, ৫০০ জন ট্রেনি, ২০০ জন অ্যাপ্রেন্টিস কাজ করত। এছাড়া ১২০০ ঠিকা শ্রমিক সরাসরি উৎপাদনে এবং প্রায় ১৫০০ ঠিকা শ্রমিক অন্যান্য নানা কাজে যুক্ত ছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায়, স্থায়ী শ্রমিকেরা সব মিলিয়ে হাতে পেত মাসে ১৭০০০ থেকে ১৮০০০ টাকা। কিন্তু বিয়ে বা পারিবারিক কোনো সমস্যার জন্য চারদিন কাজে অনুপস্থিত থাকলে ৮৯০০ টাকা কেটে নেওয়া হত। একদিন না এলে ২২৫০ টাকা কেটে নেওয়া হত। ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে যারা আইটিআই পাশ, তারা মাইনে পেত কেটেকুটে ৭২০০ টাকা আর অন্যরা ৬২০০ টাকা। কিন্তু একদিন কাজ কামাই করলে ২০০০ টাকা কেটে নেওয়া হত। কোনো প্রতিবাদ করলেই ঠিকেদার কাজ থেকে বসিয়ে দিত। কথায় কথায় সুপারভাইজার আর ম্যানেজারেরা স্থায়ী শ্রমিকদের গালিগালাজ করত, কলার চেপে ধরত। বেয়াদব শ্রমিককে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে সরিয়ে দেওয়া হত। একজন শ্রমিক বলেছিলেন, 'চায়ের জন্য সাত মিনিট বরাদ্দ সময়ে ৪০ গজ হেঁটে গিয়ে এক হাতে কাপ আর মুখে ব্রেড পকোড়া গুঁজে নিতে হত। প্যান্টের চেন খুলে পেচ্ছাপ করার জন্য দু-মিনিট হেঁটে গিয়ে লাইন লাগাও ... কাজের এমন চাপ যে চুলকুনি থাকলেও চুলকানোর সময় নেই ... কোম্পানি এক কোটি গাড়ি বানানোর পর মোবাইল ফোন উপহার দিয়েছে, কিন্তু কথা বলার ফুরসত তো দেয়নি ... ১৭০০০ টাকা মাইনে বলে হাতে ১২০০০ দেয়। হাতে পেয়ে বউ সন্দেহ করে ...।' আসলে আমরা পরে জানতে পারি, স্থায়ী শ্রমিকদের বেতন কাঠামো এমন ছিল যার ৫০% পর্যন্ত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা এবং কারখানায় উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া দুই শিফ্টের মাঝে অতিরিক্ত কাজের জন্য এবং কাজের ত্রুটি সংশোধনের জন্য গড়ে প্রতিদিন দু-ঘণ্টা বিনা ওভারটাইমে খেটে দিতে হত। কাজের চাপ ছিল মাত্রাছাড়া। গড়ে ৪৫ মিনিটে একটা গাড়ি তৈরি করতে হত। বিশ্রাম তো দূরস্থ, টিফিন খাওয়া বা বাথরুমে যাওয়ার জন্যও যথেষ্ট সময় পেত না শ্রমিকেরা।

জাপানের সুজুকি কোম্পানি এখানে জাপানি ওয়ার্ক কালচারের আদলে অত্যন্ত সংগঠিত ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে আসে। স্থানীয় গ্রামগুলো থেকে আসা শ্রমিকেরা প্রথমে এটা ভালোভাবেই নিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারে যে এই অভিনব শৃঙ্খলা–পদ্ধতির মধ্যে একটা সংগঠিত শীতল হিংসা রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে সেটা সামান্যই বোঝা যায়। যেমন, শ্রমিকদের তুই–তোকারি–গালিগালাজ আর কলার চেপে ধরা তো ছিলই। ঠিকা শ্রমিকদের সামান্য 'বেআদবি' দেখলে নিঃশব্দে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হত। এই সুসংগঠিত ও লাগাতার দমনের সামনে দীর্ঘকাল শ্রমিকেরা ছিল অসহায়।

২০০০ সাল থেকে ম্যানেজমেন্টের নিয়ন্ত্রিত একটা ইউনিয়ন (মারুতি উদ্যোগ কামগর ইউনিয়ন) শ্রমিকদের মাথার ওপর চেপে বসেছিল। খোদ ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের পেমেন্ট থেকে ইউনিয়নের চাঁদা কেটে নিত! এগারো বছর সেই ইউনিয়নের কোনো নির্বাচন হয়নি। এমন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানেসর প্ল্যান্টের স্থায়ী শ্রমিকেরা দু–হাজার টাকা করে চাঁদা দিয়ে গোপনে নতুন ইউনিয়ন বানানোর তোড়জোড় শুরু করল।

মারুতি শ্রমিকদের নতুন ইউনিয়নের প্রস্তুতি

সেইসময় দিল্লি, নয়ডা, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ শিল্পাঞ্চলে যে শ্রমিকেরা কাজ করত, তাদের ৭০–৭৫ শতাংশ কোম্পানির নথিভুক্ত ছিল না। স্থায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি ছিল অস্থায়ী শ্রমিকেরা। অস্থায়ীদের মধ্যে ছিল ক্যাজুয়াল এবং ঠিকা শ্রমিক। ঠিকেদাররা সকলে রেজিস্টার্ড নয়। শ্রমিকদের মধ্যে সকলে ইএসআই এবং পিএফ পেত না। ফ্যাকট্রিগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের ৭৫–৮০ শতাংশ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন পেত না। ফ্যাকট্রিতে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা ডিউটি এক সাধারণ চিত্র। ৯৫–৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে ওভারটাইম করলে দ্বিগুণ বেতন পাওয়া যেত না। এইরকম পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা কারখানায় কারখানায় ম্যানেজমেন্টের জুলুমের প্রতিবাদে নিজেরাই কাজ বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়ত। রিকো অটো, ডেল্পো, ভিভা গ্লোবাল, হরসূর্য হেল্‌থকেয়ার, সেন্ডেন বিকাশ ফ্যাকট্রিতে প্রতিবাদী শ্রমিকদের কারখানার গেটের বাইরে বের করে দিতে ম্যানেজমেন্ট সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু হন্ডা ও হিরো হন্ডা–তে ঠিকা শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার পর তাদের গেটের বাইরে আনতে কোম্পানি ও সরকারি প্রশাসনের ঘাম বেরিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে মানেসরে শ্রমিকেরা এবার একটা স্বাধীন ইউনিয়ন গঠন করতে চাইল।

৪–১৭ জুন ২০১১ : মানেসর মারুতি কারখানা শ্রমিকদের দখলে

৩ জুন মানেসর প্ল্যান্টের ১১ জন শ্রমিক নতুন ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজে চণ্ডীগড়ে হরিয়ানা সরকারের শ্রম মন্ত্রকে গিয়েছিল। সেই খবর কোম্পানির কাছে আসার পর ম্যানেজমেন্ট নতুন ইউনিয়নকে সাবোতাজ করার জন্য পুরোনো মারুতি উদ্যোগ কামগর ইউনিয়নের পক্ষে সাদা কাগজে শ্রমিকদের সই করাতে শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ৪ জুন মানেসর ফ্যাকট্রির ভিতর এ–শিফটের শ্রমিকদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের বচসা হয়। দুপুর

তিনটে কুড়ি নাগাদ শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে বি–শিফ্‌টের শ্রমিকেরাও কারখানার ভিতর এসে জড়ো হয়েছে। ফোন করে সি–শিফ্‌টের শ্রমিকদের ফ্যাকট্রির ভিতর ডেকে আনা হয়। তিন শিফটের স্থায়ী শ্রমিক, ট্রেনি, অ্যাপ্রেন্টিস ও ঠিকা শ্রমিক মিলে আনুমানিক তিন হাজার শ্রমিক কারখানার ভিতর জোটবদ্ধ হয়। শুরু হয় তাদের একতাবদ্ধ ধর্মঘট। **মানেসর কারখানা শ্রমিকদের দখলে চলে যায়।** শ্রমিকদের আচমকা এই পদক্ষেপে ম্যানেজমেন্ট হতবাক হয়ে যায়। হরিয়ানা সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার অসহায়! রাত ভোর হয়। কারখানা দখল করে শ্রমিকদের এই অভিনব ধর্মঘট চলতে থাকে। প্রথম ৪৮ ঘণ্টায় কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, শ্রমিকদের পানীয় জল, পায়খানা–পেচ্ছাপ, খাওয়াদাওয়া করতেও বাধা দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু তাতে কী! দিনের পর দিন কাজের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে সকলে একসঙ্গে কাটানো — এমন দিন স্বপ্নেও শ্রমিকদের জীবনে আসেনি। প্রত্যেকে নিজের মতো করে এই অবসরকে উপভোগ করে। ব্যক্তিগত একান্ত গল্প, আড্ডা, হইচই, গান, নাচ — কী হয়নি এই দিনগুলিতে! শ্রমিকেরা অনেকেই বয়সে যুবক, তারা যেন পাখা মেলে উড়ছিল।

শ্রমিকদের কারখানার বাইরে আনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত শ্রমিক–বিরোধী পক্ষ হায় হায় করতে থাকে। কারখানা দখলের তৃতীয় দিন ৬ জুন কোম্পানি বেছে বেছে ১১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে, যাদের নাম নতুন ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্তে ছিল। কোম্পানি ওই ১১ জনকে কারখানার বাইরে পাঠাতে বলে, নচেৎ পুলিশ ধর্মঘট ভেঙে কারখানায় ঢুকবে। শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

এরপর কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি মানেসর কারখানার শ্রমিকদের কথাবার্তা শুরু হল। একটা আপোশ–মীমাংসার চেষ্টা উভয় তরফেই দেখা গেল। অবশেষে গুরগাঁও সার্কেল ২–এর অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার জে পি মানের মধ্যস্থতায় ১৬ জুন একটা চুক্তি হয়। তাতে ১১ জন ছাঁটাই শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এর আগে শ্রমিকেরা কাজে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা স্বরূপ তিনদিনের মাইনে কেটে নেওয়া হত। এই চুক্তিতে ঠিক হল, প্রতিদিন অনুপস্থিতির জন্য একদিনেরই মাইনে কাটা যাবে। ১৮ জুন শ্রমিকেরা ফের কাজ শুরু করল। সবচেয়ে বড়ো কথা, ১৩ দিন শ্রমিকদের দখলে থাকার পর ফ্যাকট্রির ভিতর সুপারভাইজার এবং ম্যানেজারদের রোয়াব আর তুইতোকারি সাময়িকভাবে বন্ধ হল। জুন ২০১১–র আগে মানেসর ফ্যাকট্রিতে এ–শিফ্‌ট শুরু হত সকাল ৭টার জায়গায় ৬টায় আর বি–শিফ্‌টে রাত সাড়ে বারোটার জায়গায় ১টা ৪০ মিনিটে ছুটি হত। প্রতিদিন এই দু–ঘণ্টার ওভারটাইম ম্যানেজমেন্ট হিসেবে দেখাত না এবং ডাবলের বদলে সিঙ্গল রেটে শ্রমিকদের পেমেন্ট করত। তেরো দিনের দখল আন্দোলনের পর এই ওভারটাইম কাজ বন্ধ হয়ে গেল। মানেসর প্ল্যান্টের কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা যায়, কারখানায় প্রতিদিন গাড়ির উৎপাদন ১২০০ থেকে ১১০০–তে নেমে আসে।

১৬ জুন পুরোনো কামগর ইউনিয়ন এই প্রথম তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। মানেসর প্ল্যান্ট থেকে মাত্র গোটা বারো ভোট পড়ে। ২৬ জুন কিছু মামুলি কারণ দেখিয়ে রেজিস্ট্রার নতুন ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নাকচ করে দেন।

শ্রমিকদের কারখানা দখলের প্রতিশোধ নিল কোম্পানি

টানা তেরো দিন শ্রমিকদের দখলে থাকার পর ১৮ জুন ২০১১ কারখানা চালু হল বটে, কিন্তু কোম্পানি নতুন মতলব আঁটতে থাকল। ঠিকা শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা এমনিতেই বেশি থাকে। বাড়তি কাজের জন্য ২৭ জুলাই ঠিকা শ্রমিকেরা কিছু অতিরিক্ত শ্রমিক চাইল সুপারভাইজারের কাছে। জবাবে সুপারভাইজার তাঁর পুরোনো অভ্যাসে গালিগালাজ দিলেন। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকেরা ঠিকা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেই সুপারভাইজার তথা শিফ্‌ট ইনচার্জ ক্ষমা চেয়ে নিলেন। ২৮ জুলাই কারখানার ভিতর পুলিশ ঢুকে শপ থেকে ৪ জন শ্রমিককে ধরে নিয়ে গেল। গোটা ফ্যাকট্রির শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দিল। ম্যানেজাররা সেই ৪ জনকে নিয়ে এসে সমস্ত শ্রমিকদের আশ্বস্ত করলেন যে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। আবার উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কোম্পানি বি–শিফ্‌টের শ্রমিকদের নিয়ে আসার বাস বন্ধ করে দিল। বি–শিফ্‌টের শ্রমিকদের মধ্যে যারা আশেপাশে থাকে, তারা হেঁটে চলে এল গেটে; দূরের শ্রমিকেরাও কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে চলে এল। কোম্পানি তাদের প্ল্যান্টে ঢুকতে দিল না। এ–শিফ্‌টের শ্রমিকেরা কারখানার বাইরে বেরোল না। এক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর বি–শিফটের শ্রমিকদের গেটে ঢুকতে দেওয়া হল। পরে কোম্পানি চুপিচুপি সেই ৪ জনকে সাসপেন্ড করল। শ্রমিকরা সেই খবরটা জানতে পেরেই কোম্পানিকে সাসপেনশন রদ করতে বলল। ম্যানেজমেন্ট জানাল, আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক, তারপর দেখা যাবে। ৮ আগস্ট শ্রমিকেরা কারখানার পরিস্থিতি এবং উৎপাদন স্বাভাবিক করল। কিন্তু কোম্পানি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। ১৭ আগস্ট তারা জানাল, সাসপেনশন তোলা হবে না। শ্রমিকেরা বলল, ঠিক আছে, আমরা ৪৮ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, আপনারা আর একবার ভেবে দেখুন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কোম্পানি শ্রমিক নিয়োগ পরিকল্পনা বদলে ফেলেছে। কানপুর, রেওয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে নতুন শ্রমিক এনে ভর্তি করা হয়েছে। সাহেবদের মুখে আবার পুরোনো বুলি ফুটে উঠল, তুই–তোকারি শুরু হয়ে গেল। শ্রমিকেরা উৎপাদন কমিয়ে দিল। ২৩ আগস্ট দুজন স্থায়ী শ্রমিককে সাসপেন্ড করা হল। ২৪ আগস্ট আরও দুজনকে। শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করল। ২৫ আগস্ট থেকে উৎপাদন বাড়ানো শুরু হল। কারখানার গেটের ভিতর পার্ক বা যে খোলা জায়গায় শ্রমিকেরা একত্রিত হত, সেই জায়গাটা কোম্পানি লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিল। ২৩ থেকে ২৬ আগস্ট প্রতিদিন ঠিকেদাররা যথাক্রমে ৪, ৩, ১৬ আর ১০ জনকে কাজ থেকে বসিয়ে দিল।

কোম্পানি কারখানা গেটকে দুর্গে পরিণত করল

২৮ আগস্ট ২০১১ ছিল রবিবার, কারখানার ছুটির দিন। ছুটছাট কিছু কাজের জন্য কোম্পানি দেড়–দুশো শ্রমিককে কারখানায় ডিউটি দিত ছুটির দিনে। এটা ওভারটাইম, অথচ খাতায়–কলমে দেখানো হত না। এইদিন দুপুরের পর স্টাফেরা আসতে শুরু করল। রাত আটটার সময় ক্যাম্প খাটানোর সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে চার–পাঁচশো পুলিশ ফ্যাকট্রির ভিতরে ঢুকল।

রাত সাড়ে আটটার সময় সুপারভাইজাররা কাজ থেকে ওই দেড়–দুশো শ্রমিককে তুলে নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। পরদিন ২৯ আগস্ট এ–শিফটের শ্রমিকেরা গেটের কাছে পৌঁছে দেখল, কোম্পানি কারখানার গেটকে দুর্গে পরিণত করেছে। সাধারণত গেটে গ্রুপ–ফোর গার্ডেরা থাকে। এদিন তাদের সঙ্গে গেটের বাইরে তৈরি ছিল ৫০–৬০ জন পুলিশ। ফ্যাকট্রির ভিতরে টেপ রেকর্ডার বাজছিল : 'স্থায়ী শ্রমিক এবং ট্রেনিরা গুড কন্ডাক্ট বন্ডে সই করে ভিতরে যাও। ঠিকেদারের আন্ডারে যারা আছো, নিজের নিজের ঠিকেদারের সঙ্গে দেখা করো। অ্যাপ্রেন্টিসদের তিনদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে ...' গেটের বাইরে নোটিশ লটকানো ছিল — তাতে ছিল বরখাস্ত পাঁচজন স্থায়ী শ্রমিকের নাম, ট্রেনিং সমাপ্ত অর্থাৎ বরখাস্ত ৬ জন ট্রেনির নাম, সাসপেন্ড ১০ জন স্থায়ী শ্রমিকের নাম। সমস্ত শ্রমিক গেটের বাইরেই থাকল। বি ও সি শিফটেও একই পরিস্থিতি বহাল থাকল। এদিকে ২৯ তারিখ আশপাশের গ্রামে যেসব ঠিকেদার থাকে, তারা ঠিকা শ্রমিকদের শাসাতে লাগল, ধাক্কাধাক্কি করে হুমকি দিল, 'খবরদার মারুতি–সুজুকি ফ্যাকট্রির গেটে যাবি না'। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকেরাও গ্রামে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে থাকল। ৩০ আগস্ট ফ্যাকট্রিতে টেপ বাজতে থাকল। নতুন করে ১২ জন ট্রেনিকে ছাঁটাই করা হল। আরও ১৬ জন স্থায়ী শ্রমিককে সাসপেন্ড করা হল।

৩১ আগস্ট গেটের কাছাকাছি শ্রমিকেরা জড়ো হল। নেতারা বক্তৃতা দিতে থাকল। গান–টানও চলল। শ্রমিকেরা ১২ ঘণ্টা করে বদলি হাজিরা দিয়ে দিনরাত অবস্থান চালাতে শুরু করল। ১ সেপ্টেম্বর এই অবস্থানে এল বহু সংগঠনের নেতা — মারুতি–সুজুকি গুরগাঁও ফ্যাকট্রি, সুজুকি পাওয়ারট্রেন, নেপিনো অটো, রিকো, ওমেক্স, লুমেক্স, হিরো হন্ডা, সোনা স্টিয়ারিং ইত্যাদি কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের পাশাপাশি জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমেত পাঁচ হাজার মানুষ জমায়েত হল। এবার পত্রপত্রিকার লোকেরাও আসতে শুরু করল। ফ্যাকট্রির টেপ রেকর্ডারে নতুন সুর শোনা গেল : ৫ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপ্রেন্টিসরা কাজে যোগ দাও। ৫ সেপ্টেম্বর ফ্যাকট্রি থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে–৮ পর্যন্ত শ্রমিকদের দর্শনীয় মিছিল হল।

২০১১ সালের আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাস ছিল মারুতি–সুজুকির মানেসর প্ল্যান্টে মালিক শ্রমিক উভয়পক্ষের প্রস্তুতিপর্ব। শ্রমিকেরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে তেমন কিছু না করতে পারে, ম্যানেজমেন্ট তার ব্যবস্থা পাকা করছিল। শ্রমিকদের ওপর ছাঁটাই–সাসপেনশনের আক্রমণ তো ছিলই। তার ওপর পুলিশ–ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। ৬০০ একর জায়গার ওপর এই মানেসর ফ্যাকট্রি এতদিন নিচু দেওয়াল আর তারজাল দিয়ে ঘেরা ছিল। অক্টোবর মাসের গোড়ায় চারপাশে উঁচু দেওয়াল তোলা হল। কারখানা এবার দুর্গের চেহারা নিল। কিন্তু মানেসরে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অন্য এক প্রক্রিয়া গড়ে উঠল।

১২ সেপ্টেম্বর মারুতি সুজুকিতে শ্রমিক–বিক্ষোভের ঢেউ পৌঁছাল এখানকার সেক্টর ৩–এর মুঞ্জাল শোয়া ফ্যাকট্রিতে। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেয়। মুঞ্জাল শোয়ার গুরগাঁও এবং হরিদ্বার ফ্যাকট্রিতেও কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন মঙ্গলবার রাত আটটার সময় ১৫৫ জন শ্রমিককে কোম্পানি স্থায়ীকরণ করে। ১৪ সেপ্টেম্বর আইএমটি–মানেসরে বিকেল চারটের সময় সুজুকি পাওয়ারট্রেন কাস্টিং ফ্যাকট্রি,

সুজুকি পাওয়ারট্রেন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ইঞ্জিন ফ্যাকট্রি এবং সুজুকি মোটরসাইকেল ফ্যাকট্রির দুই শিফ্টের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে ফ্যাকট্রির ভিতরেই বিক্ষোভ শুরু করে। শ্রমিকেরা শ্লোগান দিয়ে বলে : **মারুতি সুজুকি মানেসর ফ্যাকট্রির সমস্ত শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে; গুড কন্ডাক্ট বন্ড হটাতে হবে।**

১৫ সেপ্টেম্বর ওই তিন ফ্যাকট্রির বিক্ষোভ চলতে থাকে। মারুতি সুজুকির গেটেও শ্রমিকদের মধ্যে উল্লাস দেখা যায়। তারা শ্লোগান দেয়, বক্তৃতা করে, গান গায় আর প্রচারপত্র বিলি করে। নানারকম আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। সেল অ্যান্ড ডেসপ্যাচ-এর ড্রাইভাররা সি-শিফ্টে কাজ বন্ধ করে দেয়। ঠিকেদারের অধীনস্থ ৩৫০ জন ড্রাইভার এ এবং বি-শিফ্টে সেল অ্যান্ড ডেসপ্যাচ গেটের বাইরে জমা হয়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে খোলা মাঠে তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ১৬ সেপ্টেম্বর সুজুকি পাওয়ারট্রেন কাস্টিং ফ্যাকট্রি, সুজুকি পাওয়ারট্রেন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ইঞ্জিন ফ্যাকট্রি এবং সুজুকি মোটরসাইকেল ফ্যাকট্রির ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের আলোচনায় ডাকে। শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের অনুরোধে কাজ শুরু করে। ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে শ্রম দপ্তরে মারুতি সুজুকির ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা ভেঙে যায়। সেখান থেকেই পুলিশ তিনজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। শ্রমিকেরা উত্তেজিত না হয়ে তাদের জামিনের জন্য চেষ্টা করে। ২০ তারিখ তারা ছাড়া পায়। ওদিকে ট্রেনিদের ফোন করে জানানো হয়েছিল, ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজে না এলে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে। ২০ তারিখ থেকে টেলিফোনে কোম্পানির সুর পাল্টাতে থাকল। প্রথমে, 'ডিয়ার এমপ্লয়ি ...', তারপর 'মারুতি পরিবারের প্রিয় সাথি', তারপর 'প্রিয় সহকর্মী' সম্বোধন চলতে থাকল। এমনকী শ্রমিকদের গ্রামের বাড়িতেও পৌঁছে গেল ম্যানেজারেরা। বাড়ির লোককে শ্রমিকেরা বলল, 'কিছু জিজ্ঞেস না করে ঠান্ডা এনে সাহেবকে খাইয়ে দাও আর আদর করে বিদেয় করো।' আশপাশের কিছু পঞ্চায়েত-সরপঞ্চকে কোম্পানি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একত্রিত করল। তাদের দিয়ে শ্রমিকদের বলানো হল, ফ্যাকট্রির ভিতরে ঢোকো, নাহলে এখান থেকে ভাগো। রাতে তাদের মদ খাইয়ে গাড়ি করে এলাকায় ঘোরানো হল। গ্রামে শ্রমিকদের ঘরের ভাড়া বাড়ানো হল। কিন্তু এসবে কোনো ফল হল না। ২৩ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের নেতারা তিনটে বাসে করে শ্রমিকদের নিয়ে মানেসর ফ্যাকট্রির গেটে এল। সুজুকির অন্য ফ্যাকট্রি থেকেও নেতারা এল। বক্তৃতা আর কথাবার্তা হল। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা চালানোর জন্য গুরগাঁও ফ্যাকট্রির কামগর ইউনিয়নের নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হল। ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে একটা লিখিত চুক্তি হল। চুক্তি অনুযায়ী ৩ অক্টোবর স্থায়ী শ্রমিকেরা কারখানায় প্রবেশ করল। কিন্তু ১২০০ ঠিকা শ্রমিককে কাজে নেওয়া হল না। ৪ ও ৫ তারিখ একইভাবে চলল। দশেরার পর ৭ তারিখ ঠিকা শ্রমিকেরা কারখানার গেটে জমা হল।

দ্বিতীয় দফায় মানেসরে এগারোটি কারখানা শ্রমিকদের দখলে

৭ অক্টোবর ঠিকা শ্রমিকদের ধমকানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হল কোম্পানির ভাড়াটে বাউন্সারেরা। একজন সাসপেন্ড স্থায়ী শ্রমিকের সঙ্গে সেই পালোয়ানদের বচসা হল। দ্রুত

আইএমটি-মানেসরের তামাম ফ্যাকট্রির শ্রমিকদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হল। দুপুর একটার সময় মারুতি সুজুকির গেটে সকলে একত্রিত হল। ঠিক হল, বিকেল চারটের সময় এ এবং বি-শিফটের শ্রমিকেরা মিলে কারখানা দখল করে নেবে। শ্রমিকেরা কারখানা দখল করল। মারুতি সুজুকির সঙ্গে সুজুকি ইঞ্জিন, সুজুকি কাস্টিং, সুজুকি মোটরসাইকেল, সত্যম অটো, বাজাজ মোটর, ইন্ডিওরেন্স হাইলেক্স, লুমেক্স, লুমেক্স ডি কে ডিঘানিয়া-র শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে নিজের নিজের কারখানা দখল করল। দাবি করা হল, মারুতি সুজুকির ১২০০ ঠিকা শ্রমিককে কারখানায় কাজে নিতে হবে। **৭ অক্টোবর বিকেল চারটে থেকে আইএমটি-মানেসরের ১১টি ফ্যাকট্রি দখল করে ধর্মঘট শুরু হল।** শ্রম দপ্তর এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করল।

একবছরের মধ্যে দু-দুবার ঘটল শ্রমিকদের এই কারখানা দখল। শ্রমিকেরা পরদিন ৮ তারিখ সাতটি কারখানার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। সেগুলিতে কোম্পানিদের দখল ফিরে আসে। সেদিন থেকে সুজুকি গোষ্ঠীর বাকি চারটি কারখানায় শ্রমিকদের দখল চলতে থাকে। এক শ্রমিকের ভাষায় : '৭ থেকে ১৪ অক্টোবর মারুতি-সুজুকি কারখানার ভিতর এক দারুণ সময় ছিল। না ছিল কোনো কাজের টেনশন, না ছিল আসা-যাওয়ার হয়রানি। বাস ধরবার চিন্তা ছিল না। খাবার তৈরির টেনশন ছিল না। এমনকী খাবার খাওয়ার চিন্তাও ছিল না যে ৭টা বা ৯টায় খেয়ে নিতে হবে। এ নিয়ে কোনো টেনশন ছিল না যে আজ কী বার, কত তারিখ। নিজেদের মধ্যে কত কথা তখন হত। পরস্পর এত কাছাকাছি আর কখনো আসা হয়নি, যা এই সাতদিনে হয়েছিল।' কোম্পানি আর সরকারের বাস্তবতা এই সাতদিনের জন্য পিছনে চলে গিয়েছিল। কায়েম হয়েছিল শ্রমিকদের অবাস্তবতা!

১৯ অক্টোবর ২০১১ তৃতীয় চুক্তি হল। ৬৪ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ঠিকেদারের অধীনস্থ ১২০০ শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু মারুতি-মানেসরের ৩০ জন এবং সুজুকি পাওয়ারট্রেনের ৩ জনের ওপর সাসপেনশন রয়ে গেল। স্থির হল, আগের ৪৫ সেকেন্ডে একটি গাড়ি তৈরির (অ্যাসেম্বলি করা) বদলে এখন ১ মিনিটে হবে। কোম্পানি প্রচলিত বাস্তবতার নতুন ঘেরাটোপ তৈরিতে লেগে গেল। অক্টোবরের দিনগুলোতে সুজুকি পাওয়ারট্রেন কারখানার তিনজন শ্রমিক মারুতি-সুজুকির শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির কাজে বিশেষ আগুয়ান ভূমিকা নিয়েছিলেন। যেহেতু এই তিনজন একটা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ১৯ অক্টোবর চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন, তাই এদের বাদ দিয়ে ২১ অক্টোবর চুক্তি সেরে নেওয়া হল। ৪২ ঘণ্টার এই নেগোশিয়েশনে হরিয়ানা সরকারের শ্রম মন্ত্রক, পুলিশ এবং মারুতি সুজুকি ম্যানেজমেন্ট অংশ নেয়। যারা তাতে স্বাক্ষর করল, তাদের কর্তৃত্ব রাখতে তিনবছরের চুক্তি করা হল এবং প্রতিবাদী তিনজনকে সাসপেন্ড করা হল। কোম্পানি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার জন্য পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ওই তিনজনকে বরখাস্ত করল। চুক্তিকারী ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকনেতারা শিল্পে শান্তি বজায় রাখলেন। সুজুকি পাওয়ারট্রেন আর মারুতি-সুজুকির সাহেবরা দুই কোম্পানিকে সংযুক্ত করে মিলিতভাবে বিদ্রোহী শ্রমিকদের চিহ্নিত করল। সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল বি-প্ল্যান্ট।

১ মার্চ ২০১২ নতুন ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন দিল সরকার। আইনগত প্রতিষ্ঠা পেল মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ১৯২৩। ম্যানেজমেন্টও এই ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিল। ফলস্বরূপ, স্থায়ী শ্রমিক এবং অন্য শ্রমিকদের আলাদা করে ফেলার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেলা হল। অথচ গতবছর এগারোটা কারখানা দখলের সময় ঠিকা শ্রমিকদের কাজের দাবিতে স্থায়ী, ঠিকা, ট্রেনি আর অ্যাপ্রেন্টিসরা সকলে একত্রিত হয়েছিল, বাস্তবে যা ছিল নজিরবিহীন। তার ছাপ ছিল এই ইউনিয়নের প্রথম দাবিসনদে, সেখানে তারা সমস্ত ঠিকা শ্রমিকের স্থায়ীকরণের দাবি পেশ করল।

মানেসর প্ল্যান্টের ৩০ জন সাসপেন্ড শ্রমিককে কোম্পানি গোপনে টাকা দিয়ে রফা করে, তারা চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কারখানা ছেড়ে চলে যায়। রাজ্য সরকার এদের বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করে। বিগত ছ–মাস যাবৎ এরা শ্রমিকদের আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ঘটনাটা জানতে পেরে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু তারা হতাশ না হয়ে নিজেদের ভিতর থেকে ইউনিয়নের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করে। ম্যানেজমেন্ট এই নেতাদের বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না। ইউনিয়ন যে দাবিসনদ দিয়েছিল, তার ওপর মার্চ মাস থেকে ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। ম্যানেজমেন্টের বেতন সংক্রান্ত ঘোষণার পর সোমবার ১৬ জুলাই আলোচনা থেমে যায়। মারুতি প্ল্যান্টগুলিতে প্রত্যেক শিফ্‌ট শুরুর আগে ২০ মিনিটের একটা সভা হয়, সেখানে শ্রমিক এবং বাবুরা সকলে কিছু ব্যায়ামও করে। ১৭ জুলাই মঙ্গলবার শ্রমিকেরা সকালে ওই সভায় অংশ নিতে অস্বীকার করে।

এই পটভূমিতেই ঘটেছিল ২০১২ সালের ১৮ জুলাইয়ের ভয়াবহ ঘটনা।

১৮ জুলাই ২০১২ : মানেসর মারুতি কারখানায় শ্রমিক বিদ্রোহ

১৮ জুলাই বুধবার সকালে ১নং প্ল্যান্টের অ্যাসেম্বলি ফ্লোরে কর্মরত জিয়া লাল নামে একজন স্থায়ী শ্রমিককে কাজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়। শ্রমিকদের কাছ থেকে যতদূর জানা গেছে (মিডিয়াতেও এই খবর সেইসময় প্রকাশিত হয়েছে) : সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ যখন জিয়া লাল এবং আরও কয়েকজন চায়ের বিরতির পর কাজের জায়গায় ফিরছিলেন, রাম কিশোর মাজি নামে একজন সুপারভাইজার তাঁদের দাঁড় করিয়ে বলেন, শিফ্‌ট শুরুর আগের সভায় তাঁদের যেতে হবে। ওঁদের মধ্যে তর্ক হয়। তখন সেই সুপারভাইজার জিয়া লালকে চেঁচিয়ে জাত তুলে গালাগালি দেন এবং তাতে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। জিয়া লাল একজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁকে সাসপেন্ড করলেও সুপারভাইজারকে তাঁর ব্যবহারের জন্য কোনো শাস্তি না দিয়ে কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকেরা জিয়া লালের সাসপেনশন তুলে নেওয়ার দাবি করে। কয়েকদিন থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। দুপুর তিনটেয় বি–শিফ্‌টের শ্রমিকেরা যখন কারখানার গেটে পৌঁছাল, ইউনিয়নের নেতারা এ–শিফ্‌টের শ্রমিকদের কারখানার ভিতর থাকতে বলল। দুপুর সাড়ে তিনটেয় নেতারা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জিয়া লালের সাসপেনশন প্রত্যাহার নিয়ে কথা বলতে যায়। শপ ফ্লোরে গাড়ি তৈরির কাজ চলতে থাকে। যদিও সকাল থেকেই শপ ফ্লোরে ভালোসংখ্যক নতুন লোককে শ্রমিকদের পোশাকে দেখা যায়। কোম্পানি তাদের নতুন নিযুক্ত বলে দাবি করলেও

তাদের পকেটের ওপর নাম লেখা ছিল না। শ্রমিকেরা বুঝতে পারে যে এদের বাউন্সার হিসেবে প্ল্যান্টে ঢোকানো হয়েছে। বিকেল পাঁচটায় শ্রমিকেরা জানতে পারে, জিয়া লালকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না এবং এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট আর কথাও বলবে না। মানেসর প্ল্যান্টের কর্তারা জানিয়ে দেয়, বিষয়টা তাঁদের হাতে নেই, ওপরতলার কর্তারাই যা কিছু করবে। দুপুরে যখন নেতারা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে যায়, তখন থেকেই শ–খানেক পুলিশ জড়ো হয় মেন গেটের সামনে। যদিও মানেসর ফ্যাকট্রির ভিজিলেন্স ম্যানেজার দীপক আনন্দ পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে দেননি। সাধারণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। এবং বাউন্সারদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের হাতাহাতি শুরু হয় ১নং প্ল্যান্টে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তা হিংসাত্মক রূপ নেয়। হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের যে ঘরে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের আলোচনা চলছিল, সেই ঘরের বাইরে থেকে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অবনীশ কুমার দেবের মৃতদেহ সেখানে পাওয়া যায়। তাঁর দুটি পায়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। মানেসর কারখানার অন্য দুটি প্ল্যান্টের শ্রমিকেরা প্রথমে ঘটনা জানতে পারেনি। কিন্তু ১নং প্ল্যান্টের একাংশে আগুন লেগে যাওয়া এবং সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ায় ওই দুই প্ল্যান্টের শ্রমিকেরা বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এইসময় পুলিশ বাহিনীকে প্ল্যান্টের ভিতরে নিয়ে আসা হয়। এরপরই শ্রমিকেরা পালাতে শুরু করে। পুলিশ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে এলোপাথাড়িভাবে তিনটে প্ল্যান্টের শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। মোট ৯০ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়।

পরবর্তীকালে মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আদালতে পেশ করা বিবৃতি থেকে কয়েকটি তথ্য জানা যায় :

- ১৮ জুলাই দু–পক্ষের যে সংঘর্ষ মানেসর প্ল্যান্টের ভিতর ঘটেছিল, সেই দুঃখজনক ঘটনায় ক্ষমতাশালী মারুতি কর্তৃপক্ষের একটা চক্রান্ত ছিল। সকাল থেকেই পুলিশকে ডেকে নিয়েছিল কোম্পানি। অথচ ঘটনা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গেটের বাইরে রাখা হয়েছিল পুলিশ বাহিনীকে।
- শ্রমিকদের পোশাক পরা বাউন্সারদের সকাল থেকেই প্ল্যান্টের ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছিল। (শ্রমিকদের ওপর বাউন্সার নামক ভাড়াটে মাস্‌লম্যানদের অত্যাচার সম্বন্ধে সকলেই পরিচিত।)
- সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি মিনিটে। শ্রমিকেরা হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ করেছে, এরকম কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানোর প্রমাণও পাওয়া যায়নি।
- ৩ মার্চ ২০১২ কোম্পানির মেডিকাল অফিসারের আদালতে পেশ করা মৃত ম্যানেজার অবনীশ কুমার দেবের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তিনি শ্বাসকষ্টের কারণে মারা যান। তাঁর ডান পায়ে হাঁটুর নিচে আঘাত লেগেছিল। কোনো ভোঁতা জিনিস দিয়ে তাঁর পায়ে আঘাত করা হয়েছিল। কিন্তু দেখে মনে হয়, এক বা দুজনের বেশি তাঁর পায়ে আঘাত করেনি।

- যে কনফারেন্স রুম (M1) থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়, সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শ্রমিকদের প্ল্যান্টে ঢোকার সময় যথেষ্ট তল্লাসি করে ঢুকতে দেওয়া হয়। একটা দেশলাই বাক্সও তারা সঙ্গে রাখতে পারে না।
- এই ঘটনায় পুলিশ যে ১৪৮ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের ৮৯ জনের নাম দিয়েছিলেন চারজন কন্ট্রাক্টর। বর্ণানুক্রমিক নামের তালিকা থেকেই তা বোঝা গিয়েছিল।

এই ঘটনার পরদিন প্ল্যান্টের ম্যানেজার দীপক আনন্দ ৬০০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড ঘটানো, সম্পত্তিহানি, হাঙ্গামা করার অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ১৪৮ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে হরিয়ানা পুলিশ। গুরগাঁওয়ের কাছে ভোঁড়সি জেলে এদের বন্দি করে রাখা হয়। এদের অনেকেই ইউনিয়নের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য। আরও ৬৬ জন শ্রমিক জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযুক্ত। মোট ৫৬৪ জন স্থায়ী ও ১৮০০ ঠিকা শ্রমিককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনার পর কোম্পানি লকআউট ঘোষণা করে। ম্যানেজমেন্ট পক্ষের যে ৯০ জনের সামান্য আঘাত লেগেছিল, তারা এক সপ্তাহের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। যদিও ওই ঘটনায় আহতদের মধ্যে ম্যানেজার, পুলিশ এবং শ্রমিক সকলেই ছিল। ২১ আগস্ট মানেসরের প্ল্যান্টে ফের কাজ চালু হয়। দেড় হাজার পুলিশ মোতায়েন হয় গেটের বাইরে।

সাধারণত এধরনের ঘটনায় জামিন পায় অভিযুক্তেরা। কিন্তু সেশন কোর্ট এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট জামিনের সমস্ত আবেদন নাকচ করে, অপরাধের গভীরতা এবং বিদেশি বিনিয়োগের গুরুত্ব বিচারে। অবশেষে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট দুজনের জামিন মঞ্জুর করে এবং মার্চ মাসে নিম্ন আদালত আরও ৭৭ জনকে জামিন দেয়।

মানেসরে মারুতি এবং অন্যান্য কারখানায় বিদ্রোহ–পরবর্তী পরিস্থিতি

আইএমটি মানেসরে মারুতি সুজুকি ছাড়াও অটোমোবাইল, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিকাল, আইটি সমেত কয়েক হাজার কারখানা রয়েছে। এছাড়া গুরগাঁও, ওখলা, নয়ডা, ফরিদাবাদে যেসব কারখানা রয়েছে, তার মধ্যে ৩০০টি মারুতির অফিসিয়াল সাপ্লায়ার আর কয়েক হাজার আনঅফিসিয়াল সাপ্লায়ার ইউনিট রয়েছে। মারুতি সুজুকি কেবল ভারত বা জাপানের ব্যাপার নয়, তারা ১২০টি দেশে মোটরগাড়ি রপ্তানি করে।

মারুতি গাড়ি কোম্পানি বেসরকারিকরণের পর ক্রমাগত দুটো বিষয়ে কোম্পানি জোর দেয় : এক, উৎপাদনের বড়ো অংশ আউটসোর্সিং করা এবং দুই, গাড়ির যন্ত্রাংশ বেশি বেশি বাইরে থেকে কিনে এনে কাজে লাগানো। এর ফলে গাড়ি পিছু কোম্পানির খরচ ক্রমাগত কমেছে। ২০০১–২০০২ আর্থিক বছরে ৩৬% 'ভ্যালু অ্যাডেড' থেকে ২০১১–২০১২য় কমে দাঁড়ায় ২৭%। মারুতি সুজুকি প্ল্যান্টের কাজ বলতে দাঁড়ায় গাড়ির অংশগুলোকে অ্যাসেম্বল করা।

১৮ জুলাইয়ের ঘটনার পর সমস্ত শ্রমিক জানত যে কোম্পানি আর সরকার এবার বদলা নেবে। যেহেতু মারুতি সুজুকির শ্রমিকদের পাশে অন্য শ্রমিকেরাও শামিল হচ্ছিল, সরকার

আইএমটি মানেসর জুড়ে স্থায়ীভাবে ৬০০ কমান্ডো পুলিশ মোতায়েন করল। আর মারুতি সুজুকির একজন বড়ো ম্যানেজার তো বলেইছিলেন, 'এটা একটা শ্রেণীযুদ্ধ'।

প্রথমেই মারুতি কোম্পানি ঘোষণা করল, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার (টেম্পোরারি ওয়ার্কার) রাখা হবে না। এতকাল স্থানীয় কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে আশপাশের গ্রামগুলো থেকে ঠিকা শ্রমিকদের নিয়ে আসা হত। ফলত, প্ল্যান্টের বাইরেও শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল। এখন তাদের বদলে কোম্পানি সরাসরি একটা নতুন ক্যাটেগরি 'কোম্পানি ক্যাজুয়াল' নিয়োগ করা শুরু করল। কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের তুলনায় এই নতুন ক্যাটেগরির শ্রমিকদের ওপর ম্যানেজমেন্টের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। গুরগাঁওয়ে এই সিস্টেম আগে ছিল। প্রথমে নিয়োগ–প্রার্থী শ্রমিককে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে নেওয়া হল। এক বছর তাদের দেখার পর পরীক্ষা নিয়ে দু–বছরের ট্রেনি হিসেবে সিলেক্ট করা হল। এরপর তাদের কোম্পানি ক্যাজুয়াল হিসেবে কাজে নেওয়া হল। কিন্তু ৭ মাস পর তাদের বিদেয় করা হল। পাঁচ মাস পর আবেদন করলে তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ফের অস্থায়ীভাবেই পুনর্নিয়োগ করা হল। আগে টেম্পোরারি ওয়ার্কাররা প্রায়শই বেশ কয়েক বছর কোম্পানিতে কাজ করত। নতুন নিয়োগ–নীতির ফলে প্রোডাকশন মাত্রা কিছুটা মার খেল বটে। ২০১১ সালে শ্রমিকদের প্রথমবার কোম্পানি দখলের পর এক এক লাইনে ৪৫ সেকেন্ডে একটা গাড়ির জায়গায় এক মিনিটে একটা গাড়ি তৈরি হচ্ছিল। উৎপাদন–মাত্রা কিছুটা কমেছিল। তখন দু–শিফ্‌টে ৯৬০টা গাড়ি তৈরি হত। ২০১৩ সালের নভেম্বরে তা ৭৯৫–তে নেমে এল। কোম্পানি চেয়েছিল যে ২০১৪–তে সেটা ৯০০–তে তুলে নেওয়া যাবে। কিন্তু গাড়ি শিল্পে মন্দার কারণে গাড়ির চাহিদা কমে গেল। ম্যানেজমেন্ট এক একটা প্রোডাকশন লাইন বন্ধ রেখে সেই শ্রমিকদের প্রতি শিফ্‌টে এক ঘণ্টার জন্য ঝাড়ু দিতে পাঠাল। কারণ উৎপাদন বাড়লে শ্রমিকদের অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

১৮ জুলাইয়ের পর মানেসর প্ল্যান্টের ১০০০ জন স্থায়ী শ্রমিকের মধ্যে ৫৫০ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। সেই জায়গায় গুরগাঁও প্ল্যান্ট থেকে ১৫০ জন স্থায়ী শ্রমিককে নিয়ে আসা হল। এদের মূলত মানেসরের সি–প্ল্যান্টে পাঠানো হল। ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ওই প্ল্যান্ট চালু হয়েছিল। অতএব স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা কমে গেল আর তুলনায় কোম্পানি ক্যাজুয়াল ও ট্রেনিদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। অবশ্য মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং এবং ট্রান্সপোর্টে শ–দেড়েক কন্ট্রাক্ট শ্রমিক থাকল। স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকদের বেতনের ফারাকও পরিকল্পিতভাবে বাড়িয়ে তোলা হল :

জুন ২০১১ : স্থায়ী শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১৩,০০০–১৭,০০০ টাকা
ট্রেনিদের ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা
ঠিকা শ্রমিকদের ৬,২০০ থেকে ৭,২০০ টাকা

নভেম্বর ২০১৩ : স্থায়ী শ্রমিকদের ৩২,০০০—৩৬,০০০ টাকা
ট্রেনিদের ১৬,০০০ থেকে ১৮,০০০
কোম্পানি ক্যাজুয়ালদের ১৩,৮০০
টেম্পোরারিদের ৫,৫০০ থেকে ৬,০০০।

এছাড়া ২০১৩-তে স্থায়ীদের 'প্রফিট শেয়ার' বোনাস হিসেবে যা দেওয়া হত তা প্রায় এক মাসের বেতনের সমান। ২০১২-তে এটা বন্ধ ছিল। গুরগাঁও প্ল্যান্টে কোম্পানি স্থায়ীদের এক থেকে তিন লক্ষ টাকা লোন দিত, দুজন মারুতি কর্মচারীকে গ্যারান্টার থাকতে হত। এইভাবে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে কোম্পানি স্থায়ী শ্রমিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়িয়ে নিল।

১৮ জুলাইয়ের ঘটনার পর গুরগাঁও প্ল্যান্ট থেকে যারা মানেসরে এল, তারা অনেকেই অবসর নেওয়ার বয়সে পৌঁছেছিল। তাদের বেতন ছিল মাসে ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা। এদের সঙ্গে কাজের জায়গায় এল কোম্পানি ক্যাজুয়াল ও ট্রেনিরা, যারা সদ্য আইটিআই ট্রেনিং ইন্সটিট্যুট থেকে এসেছে। কোম্পানির নতুন কৌশল হল, অনুগত পুরোনো শ্রমিকদের সঙ্গে অনভিজ্ঞ নতুন শ্রমিকদের একটা কম্বিনেশন তৈরি করা। আসলে ১৮ জুলাই নিয়ে একটা প্রচার বড়ো মিডিয়া ভালোভাবেই করেছিল, 'একজন ম্যানেজারকে খুন করা হয়েছে' আর এসবের মূলে 'মাথা গরম ২৫ বছরের ছেলেরা'। দুয়ে দুয়ে চার করে নেওয়া হয়েছিল। কোম্পানি তথাকথিত 'মাথা গরম' নবীন শ্রমিকদের স্বাধীন উদ্যমকে খর্ব করতে চাইল।

২০১২ সালে মারুতি সুজুকি মানেসরের সঙ্গে সুজুকি পাওয়ারট্রেনের সংযুক্তি হয়েছিল। সেখান থেকেও মানেসরে শ্রমিকদের ট্রান্সফার করা হচ্ছিল। পাওয়ারট্রেন শ্রমিকদের একটা আলাদা ইউনিয়ন ছিল। এইচএমএস-ভুক্ত এই ইউনিয়ন এই ট্রান্সফারের বিরোধিতা করল। কারণ এতে এদের ইউনিয়নের শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল। ১৮ জুলাইয়ের ঘটনায় মানেসরের নতুন ইউনিয়নের শ্রমিক-নেতারা প্রায় সকলেই গেটের বাইরে চলে গিয়েছিল। নতুন করে যে ১৩ জনকে শ্রমিকেরা নির্বাচিত করল, মানেসরের ম্যানেজমেন্ট তাদের ট্রান্সফার করল দূর-দূরান্তে মারুতি শো-রুমগুলোতে। পুলিশও এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টকে সাহায্য করল। তারা শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিল, ট্রান্সফার না মানলে ওই শ্রমিকদেরও জেলে পোরা হবে।

মানেসর প্ল্যান্টের এই ম্যানেজমেন্ট পলিসির প্রভাব অন্য কারখানাতেও কিছুটা দেখা গেল এই সময়। আসলে ১৮ জুলাইয়ের পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোম্পানিগুলোর কাছে পুরো বিষয়টা ছিল রাজনৈতিক। ফরিদাবাদ, মানেসর, ওখলা, গুরগাঁওয়ের বহু কারখানাতেই স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাক্ট, ট্রেনিদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা হল। এমনকী কোনো কোনো কারখানায় স্থায়ী শ্রমিক রাখাই হল না। স্থায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে অস্থায়ী শ্রমিকদের মানসিক ও আর্থিক দূরত্ব বজায় রাখাও ছিল ওই রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ। বেআইনি শ্রমপ্রথাও বহাল তবিয়তে চলতে থাকল, যেমন ওভারটাইমে আইনগত ডাবল পেমেন্টের বদলে সিঙ্গল পেমেন্ট করা, ইএসআই-পিএফ আইনানুগ না দেওয়া, মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ১২ ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ, এমনকী জেনারেল শিফ্‌টে ১২ ঘণ্টা কাজের পর মাঝরাত অবধি শ্রমিককে কারখানায় থাকতে বাধ্য করা, যখন তখন কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া, চুক্তি মোতাবেক বেতন না দেওয়া, ইত্যাদি চলতে থাকল।

অন্যদিকে, মারুতির ১৮ জুলাইয়ের ঘটনার পর অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকেরা আশা করছিল যে তাদের বেতন বৃদ্ধির হার আগের চেয়ে বাড়বে। এই আশা যে কোম্পানিতে যতটুকু পূরণ হচ্ছিল, তার মধ্য দিয়ে অস্থায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে বেতনের ফারাক বাড়ছিল। ফোর্ড কারখানায় যার মাসিক বেতন ছিল ৩৩,০০০ টাকা, এপ্রিল মাসে তার ১৫% বেতন

বাড়ল। হিউয়েনদাই কারখানায় যার বেতন ছিল ৩৩,৫০০ টাকা, সে ২৪,০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি আশা করছিল।

২০১৫ সালে ভারতের বৃহত্তম গাড়ি কোম্পানি মারুতি সুজুকি গুরগাঁওয়ে পুরোনো মারুতি সুজুকি কামগর ইউনিয়নের সঙ্গে একটা চুক্তি করল মারুতি সুজুকি গুরগাঁও ও মানেসর প্ল্যান্ট এবং মারুতি সুজুকি পাওয়ারট্রেন শ্রমিকদের জন্য। তিন বছরের জন্য গড়ে ১৬,৮০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হল, তার মধ্যে প্রথম বছরেই ৮,৪০০ টাকা এবং পরের দু-বছরে ২,৪০০ টাকা করে বাড়ল। কোম্পানি-ক্যাজুয়ালরা স্থায়ীদের সমান বেতন দাবি করেছিল। প্রোডাকশন লাইনে স্থায়ীদের মতো কাজ করা সত্ত্বেও তারা পেত স্থায়ীদের বেতনের অর্ধেকের চেয়েও কম বেতন। তাদের কোনো বেতন বৃদ্ধি হল না। নতুন বেতন চুক্তি স্থায়ী-অস্থায়ীদের বেতনের ফারাক আরও বাড়িয়ে দিল।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের নভেম্বরে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট সংশোধন করার ফলে মারুতির মতো কোম্পানিগুলোর আরও সুবিধা হল। তারা অ্যাপ্রেন্টিসদেরও পূর্ণ সময়ের শ্রমিকদের মতো প্রোডাকশনের কাজ করিয়ে নিতে থাকল। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে মারুতি সুজুকির মোট অস্থায়ী শ্রমিক ছিল ৬,৫৭৮ জন; ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হল ১০,৬২৬। স্থায়ী শ্রমিকেরা নামেই শ্রমিক (!) থাকল, আসলে তাদের কাজ হল অস্থায়ীদের ওপর ছড়ি ঘোরানো। সেই অস্থায়ীদের অবশ্য শ্রমিকের মর্যাদা থাকল না।

১৮ মার্চ ২০১৭ আদালতের রায়

১৮ জুলাই ২০১২-র ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর গুরগাঁও অতিরিক্ত সেশন কোর্ট ১৮ মার্চ ২০১৭ তাদের রায় ঘোষণা করল। **এই রায়ে অভিযুক্ত শ্রমিকদের ১৩ জনকে ম্যানেজার অবনীশ কুমার দেবকে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল,** চারজনকে হিংসাত্মক উপায়ে সম্পত্তির ওপর হামলা করার অপরাধে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল, আরও ১৪ জনকে ক্ষতিকর কাজ করার জন্য জরিমানা সমেত ৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল, যদিও ইতিমধ্যেই ৪ বছর কারাবাস করার ফলে তারা মুক্ত হল, বাকি ১১৭ জনকে বেকসুর খালাস করা হল। সাজাপ্রাপ্ত এই ১৩ জনের মধ্যে মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তৎকালীন অফিস-বেয়ারারদের ১২ জন রয়েছেন।

মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই রায়কে মানেনি। তারা মনে করে যে কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়া, মিথ্যা সাক্ষ্য এবং সম্পূর্ণ শ্রেণীঘৃণার ওপর ভিত্তি করে এই রায়ে শ্রমিকদের সাজা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্ত ১৪৮ জনের পক্ষে সওয়ালকারী আইনজীবী রেবেকা জন বলেছেন, ১১৭ জনের বেকসুর খালাসের রায় দেখিয়ে দিচ্ছে যে এতজন শ্রমিককে কোনো প্রমাণ ছাড়াই গ্রেপ্তার করে পাঁচ বছর বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এছাড়া শ্রমিকপক্ষের আর একজন আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে চারজন কন্ট্রাক্টরদের খাতা থেকে পাওয়া বর্ণানুক্রমিক তালিকা অনুযায়ী ৮৯ জনকে আটক করেছিল পুলিশ। কোম্পানির পক্ষ থেকে আদালতে প্রথমে এই তালিকা পেশ করা হয়েছিল। পরে সেই তালিকার সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসে কন্ট্রাক্টর বীরেন্দ্র যাদব জানান, তিনি ২৫ জন শ্রমিককে প্ল্যান্টের একাংশে

ঘটনায় যুক্ত থাকতে দেখেছেন, যাদের নাম A থেকে G পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিক তালিকায় রয়েছে। আর একজন কন্ট্রাক্টর ইয়াদ রাম আরও ২৫ জনকে প্ল্যান্টের অন্যত্র হাঙ্গামায় জড়িত থাকতে দেখেছেন, যাদের নাম G থেকে P পর্যন্ত রয়েছে। অপর একজন কন্ট্রাক্টর অশোক রানা যাদের দেখেছেন তাদের নাম P থেকে S পর্যন্ত এবং শেষ সাক্ষী রাকেশ ১৩ জনকে দেখেছেন যাদের নাম S থেকে Y পর্যন্ত তালিকায় রয়েছে। আদালতে এই সাক্ষ্যদান নেহাতই হাস্যকর।

বিচার চলাকালীন এই আদালতে মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি রাম মেহের পেশ করেছিলেন, ঘটনার দিন প্ল্যান্টের ভিতর হিউম্যান রিসোর্স বিভাগে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কথা চলাকালীন কোম্পানি তাদের পে-রোলে থাকা কয়েকশো বাউন্সারকে প্ল্যান্টে ঢুকিয়ে নিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা করে। সিকিউরিটিকে দিয়ে গেট বন্ধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শ্রমিকদের পেটানো হয়। (সূত্র : ইউনিয়নের প্রেস বিবৃতি, ২০ ডিসেম্বর ২০১৪)।

মারুতি সুজুকির প্রত্যেক প্ল্যান্টের প্রোডাকশন এরিয়া এবং অফিসগুলো ক্লোজড সার্কিট টিভির মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা মনিটর করা হয়ে থাকে। ১৮ জুলাই ২০১২-র ঘটনার পর মিডিয়া রিপোর্টে জানা যায় : পুলিশ ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজগুলোর হার্ড ডিস্ক সংগ্রহ করেছে এবং তারা সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখছে। ১৯ জুলাই ২০১২ রয়টার্স-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ব্যবহার করে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করছে। অথচ চারদিন পরে ২২ জুলাই ইন্ডিয়া টুডে-র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজের হার্ড ডিস্ক ড্যামেজড, তা থেকে কোনো ছবি উদ্ধার করা যাচ্ছে না!

মারুতি শ্রমিকদের কাছ থেকে অন্য কয়েকটা তথ্য জানা গেছে : সকাল ১১টা থেকে প্ল্যান্টের সিসিটিভি ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। কোম্পানির ভিজিলেন্স ম্যানেজার দীপক আনন্দের নির্দেশে পুলিশ বাহিনীকে গেটের বাইরে রেখে ওইদিন সকালে শ্রমিকের পোশাক পরা কয়েকশো বাউন্সারকে প্ল্যান্টের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আগুন লাগার পর বড়ো বড়ো ওয়াটার জেট লাগানো স্মোক ডিটেক্টর সিস্টেম কাজে লাগানো হয়নি। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে কোম্পানি কম্পাউন্ডের ভিতর যে দুটো ফায়ার ব্রিগেড থাকে, তাদেরও হদিশ পাওয়া যায়নি। দুপুর দুটো থেকে বাইরে অপেক্ষারত পুলিশ বাহিনীকে সন্ধ্যা সাতটার পর গেটের ভিতরে ঢোকানো হয়েছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা এই নির্দিষ্ট তথ্যগুলো পাওয়ার পর 'তেহলকা' পত্রিকা মারুতি ম্যানেজমেন্টকে প্রশ্ন করলে তারা কোনো উত্তর দেয়নি। তেহলকা-তে ২৭ জুন ২০১৩-র রিপোর্ট থেকে এটা জানা যায়।

যে বিচার প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেই বিচার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এক নজরে সেই সন্দেহগুলি এরকম :

- **অভিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে আদালতে এরকম কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্ল্যান্টে আগুন লাগিয়েছিলেন কিংবা ম্যানেজারকে হত্যা করেছেন বা আঘাত করেছেন।**
- **শ্রমিকের পোশাকে ভালোসংখ্যক বাউন্সার নামক গুণ্ডাদের প্ল্যান্টে ঢোকানো হয়েছিল বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। শ্রমিকদের ইউনিফর্মের 'নেম ট্যাগ'-এ নাম লেখা থাকে, সেদিন প্ল্যান্টে ঢোকা এই নতুন লোকেদের নাম লেখা ছিল না। এই শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জব্দ করার জন্য বাউন্সার নামক পালোয়ানদের ব্যবহার করা অত্যন্ত সুবিদিত।**
- **মারুতি সুজুকির মতো এত বড়ো অত্যাধুনিক কারখানায় সিসিটিভি চালু থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক, বিশেষত যেখানে আগে থেকেই শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সেখানে ওইদিনই সিসিটিভি হার্ড ডিস্ক ড্যামেজড থাকার যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। শ্রমিকেরা একতরফাভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে থাকলে সিসিটিভি ফুটেজ থেকেই কোম্পানি অতি সহজে সত্য ঘটনা প্রমাণ করতে পারত।**
- **এত বড়ো কারখানায় যেখানে প্রতি মিনিটে একটা গাড়ি তৈরি হয়, সেখানে যথেষ্ট আগুন প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহলে ওইদিন আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেলার চেষ্টাটুকুও করা যায়নি কেন?**
- **২১ জুলাই ২০১২ থেকে মারুতি সুজুকির মানেসর প্ল্যান্টগুলিতে যেভাবে শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমপ্রক্রিয়ার খোলনলচে বদলে ফেলা হল, তাতে এই প্রশ্ন ওঠেই যে ১৮ জুলাইয়ের ঘটনা এবং তার ধারাবাহিকতায় প্রায় ২৫০০ শ্রমিককে কারখানা থেকে তাড়িয়ে না দিতে পারলে কি আদৌ সেটা বাস্তবায়িত হতে পারত?**
- **শ্রমিকদের মারমুখী প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু মানেসর প্ল্যান্ট সহ মারুতি সুজুকি কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিক বেআইনি কার্যকলাপকেও সেই বিচারের আওতায় আনা হলে কি বিচার প্রক্রিয়া একতরফাভাবে শ্রমিকদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণার রায়ের দিকে যেতে পারত?**

আমরা আশা করি যে পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়া এই বাস্তব সন্দেহগুলির নিরসন ঘটাবে এবং ১৩ জন শ্রমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো অমানবিক সাজা ফিরিয়ে নেওয়া হবে। বন্দি এবং ছাঁটাই স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকেরাও সকলে মারুতি সুজুকি কারখানায় সসম্মানে পুনর্বহাল হবে। ইতিমধ্যেই তাদের পরিবার টানা পাঁচ বছর ধরে এক দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। ছাঁটাই হয়ে যাওয়ায় তাদের পরিবারের উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।